গবাদি পশু

English

গবাদি পশু (Cattle) Bovidae গোত্রের Bos গণভুক্ত জোড়-আঙ্গুল ও খুরযুক্ত স্তন্যপায়ী। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ২০০০ বছর আগে নব্যপ্রস্তরযুগে গবাদি পশুর গৃহপালন ও বিশ্বব্যাপী সেগুলির বংশবিস্তার শুরু হয়। Bos indicus ও Bos taurus দুটি ভিন্ন প্রজাতির গরু। ভারত উপমহাদেশে Bos indicus বা ভারতীয় জেবু (কুঁজযুক্ত) গরুর বাসস্থান। এদের শারীরিক বৃদ্ধিহার কম, আকার অপেক্ষাকৃত ছোট; বিলম্বিত যৌনতা প্রাপ্তি, কম উৎপাদনশীলতা এবং পরজীবীর সহজ শিকার এদের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে, Bos taurus মাঝারি থেকে বড়, যথাসময়ে যৌনতা অর্জন, এবং মাংস ও দুধের ব্যাপারে অত্যধিক উৎপাদনশীল। গরুর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার লাঙল ও গাড়িটানা, দুধ ও মাংস উৎপাদন। বাংলাদেশে সর্বমোট প্রায় ২৩৪ লক্ষ গরুর মধ্যে বলদ ও গাভী যথাক্রমে ১১৯.১ ও ১১৪.৯ লক্ষ। এর মধ্যে দুধেল গাভী ৩৫.৩ লক্ষ, দুগ্ধহীন গাভী ২৬.১ লক্ষ, ভারবাহী ২১.৩ লক্ষ ও উন্নতমানের গরু ৪২ লক্ষ।

ষাটের দশক থেকে বাংলাদেশে অনেকেই উন্নতজাতের স্থানীয় জাতের সঙ্গে উন্নতজাত ও সংকর গরু পুষে আসছে। স্থানীয় জাতের গরুর তুলনায় বিশুদ্ধ ও সংকর গরুর পুষ্টিচাহিদা বেশি, অভিযোজনক্ষমতা কম এবং অধিকতর পরজীবী ও রোগপ্রবণ। তবে, স্থানীয় জাত কম রোগপ্রবণ ও অধিক তাপসহিষ্ণু। বাংলাদেশে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও মুন্সিগঞ্জ জেলার কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় স্থানীয় জাতের উত্তম মানের গরু পাওয়া যায়। পাবনা ও সিরাজগঞ্জের মাঝারি আকারের গরুগুলিকে পাবনা জাতের গরু বলা হয়। এ গরু দিনে ৩-৫ লিটার দুধ দিতে পারে। চট্টগ্রামে কিছু বিশিষ্ট ধরনের লাল জাতের গরু দেখা যায়। চট্টগ্রাম জাতের গরু নামে পরিচিত এগুলি প্রতিদিন প্রায় ২ লিটার দুধ দেয়। মুন্সিগঞ্জ এলাকায় 'সাদা মুন্সিগঞ্জ' নামে পরিচিত বিশেষ গড়নের এক জাতের গরুর লক্ষণীয় উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রজনন বৈশিষ্ট্য আছে।

গরুর জাত (Cattle breed) বাংলাদেশে গরুর কোনো নির্দিষ্ট জাত আজও উৎপন্ন হয় নি। কিন্তু দীর্ঘদিনের প্রাকৃতিক নির্বাচনে উদ্ভূত দেশে কতিপয় উন্নত দেশি জাতের গরু আছে। উন্নত জাতের দুধেল গরু উদ্ভবের তাগিদে এটি সম্ভব হয়েছে। এসব জাতের গরুর মধ্যে রয়েছে পাবনা, চট্টগ্রামের লাল, মুন্সিগঞ্জের সাদা এবং উত্তরবঙ্গের ধূসর জাতের গরু। বাংলাদেশে সচরাচর দৃষ্ট স্থানীয় গরুর গড়পড়তা সার্বিক উৎপাদনের তুলনায় এসব জাতের গরুর উৎপাদন ক্ষমতা বেশি।

বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি ৩৪ লক্ষ গরুর মধ্যে অধিকাংশই নানা ধরনের কাজে ব্যবহৃত শ্রেণিহীন দেশিয় জেবু (কুঁজযুক্ত) গরু। সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত ছোট আকার, কম বৃদ্ধিহার, বিলম্বিত যৌনতাপ্রাপ্তি ও অল্প দুধ উৎপাদন (গাভী প্রতি গড়ে মোট ২০৬ কেজি), এ গরুর বৈশিষ্ট্য। গরু সারা দেশে প্রায় সমভাবে ছড়ানো, তবে উত্তরাঞ্চলে গরুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

স্থানীয় গরুর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অতীতে কয়েকবারই বিভিন্ন জাতের বিদেশি গরুর সঙ্গে এদের সংকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এজন্য হোলস্টাইন-ফ্রিসিয়ান, জার্সি, শাহিয়াল, হরিয়ানা, সিন্ধি, অস্ট্রেলীয়, শাহিয়াল-ফ্রিসিয়ান ইত্যাদি জাত আমদানি করা হয়েছিল। বর্তমানে কেবল বাংলাদেশের কয়েকটি সরকারি গরুর খামারে, বাণিজ্যিক গরুর খামারে, দুগ্ধ সংগ্রহ এলাকা এবং শহর ও উপশহর এলাকায় কিছুসংখ্যক বিশুদ্ধ, সংকর অথবা উন্নত জাতের গরু দেখা যায়।

গবাদি পশুর খামার (Cattle farming) সুষ্ঠুভাবে অনেক গবাদি পশু একত্রে পালনের ব্যবস্থা। পশুপালনের মধ্য দিয়ে দুধ ও মাংসের লাভজনক ব্যবসা হলো গবাদি পশুর খামার প্রতিষ্ঠা। এটি গরু ব্যবস্থাপনার একটি সুশৃঙ্খল উপায়ও যাতে আছে গরুর সঠিক আহার যোগানো, প্রজনন ও আবাসন এবং রোগ ও পরজীবী সংক্রমণ

প্রতিরোধের ব্যবস্থা। অবশ্য, বাংলাদেশে সনাতন শস্যভিত্তিক মিশ্রচাষের অংশরূপে লাঙলটানা আর ভারবহন ও সারের উৎস হিসেবেই সাধারণত গবাদি পশু পালিত হয়।

চর এলাকায় গবাদি পশুর খামার [*ছবি: আমানুল হক*]

বাংলাদেশে গো-খামারের আকার অনুযায়ী খামারে গরুর সংখ্যা ও ব্যবস্থাপনা ভিন্ন হয়ে থাকে। জমির আয়তনের নিরিখে সাধারণত চার ধরনের খামার শনাক্ত করা হয়েছে; অতি ছোট (০.৫ একরের কম), ছোট (০.৫১-২.০০ একর), মাঝারি (২.০১-৫.০ একর) ও বড় (৫.০০ একরের বেশি)। বড় খামারে অধিক খাদ্যের সংস্থান থাকায় সেখানে সচরাচর অধিক সংখ্যক গরু থাকে।

বাংলাদেশে প্রায় ১৭.৭% গৃহস্থবাড়িতে লাঙল বা গাড়ি টানার জন্যই গরু রাখা হয়। ১৬.০১% বাড়িতে আছে দুধেল গাভী, বেশির ভাগ লোকই একটি কিংবা কদাচিৎ দুটি গাভী পোষে। কেউ কেউ ১-২ বছরের এঁড়ে-বাছুর মোটা করার জন্য সবুজ ঘাস, গমের ভুসি, ধানের ভুসি, ভাতের মাড়, ইউরিয়া ও গুড়ের ব্লক, ইউরিয়া-গুড়যুক্ত খড় ইত্যাদি গতানুগতিক ও নতুন ধরনের খাবার সরবরাহ করে। সম্প্রতি বাংলাদেশে, বিশেষত শহর ও উপশহরে গবাদি পশুর কয়েকটি ছোট আকারের বাণিজ্যিক দুগ্ধখামার ও মাংসখামার গড়ে উঠেছে।

সংকরজাতীয় গাভি (Crossbred cow) বংশগতির দিক থেকে পৃথক জাতের দুটি গরুর প্রজননের মাধ্যমে উৎপন্ন দো-আঁশলা গাভী। সংকরগুলি সাধারণত বিশুদ্ধ ধারার প্রাণীর তুলনায় গড়পড়তা অধিক উৎপাদনশীল এবং এজন্য গবাদি পশু উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মোট উৎপাদন সামর্থ্যের হিসাবেও এগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অধিক। মা-বাবার তুলনায় সংকর গরুর প্রজনন যোগ্যতাও উন্নততর। এগুলি মায়ের চেয়ে ১৪-২৪% বেশি দুধ দেয়, বাঁচেও দীর্ঘদিন। এসব সুবিধা বিবেচনায় বাংলাদেশ Bos taurus প্রজাতির সঙ্গে জেবু গরুর সংকরীকরণ ঘটিয়ে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির অজস্র চেষ্টা করেছে। ফলে এদেশে কয়েক জাতের সংকর গরু জন্মেছে। এগুলি হলো সাহিয়াল-পাবনা, ফ্রিসিয়ান-পাবনা, সাহিয়াল-স্থানীয় ইত্যাদি। এগুলির মেয়াদি দুধের পরিমাণ যথাক্রমে ১২৩৯.৯৪, ১৪৫৯.৩১, ৭২৭.৯৭ ও ১৮০০ লিটার। কিন্তু সংকরীকরণের প্রধান সমস্যা প্রত্যেকটি সংকর গরুর হিসাব রাখা, কেননা তা সংখ্যার হার ও লাভ বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সংকর প্রাণীর প্রজননে তাদের গুণমানের কিছুটা ঘাটতি দেখা দিতে পারে, কেননা বংশানুসৃতিগত বিসমসত্ত্বতার (heterozygous) দরুন প্রতি প্রজন্মে পৈত্রিক বৈশিষ্ট্যের অর্ধেক সন্তানে সঞ্চারিত হয়। বাংলাদেশে প্রতিকূল জলবায়ু, সবুজ খাদ্য ও চারণভূমির অভাব, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞানের অভাবের কারণে সংকর গরুর উৎপাদন ক্ষমতার যথাযথ বিকাশ ঘটে না। বিশুদ্ধ গরুর তুলনায় সংকরদের বেশি পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন হয়।

গবাদি পশুর খাদ্য (Cattle feed) বাংলাদেশের মতো নিবিড় কৃষিচাষের দেশে রোমন্থক প্রাণীদের খাদ্য যোগায় প্রধানত শস্যাবশেষ, দানাশস্যের উপজাত এবং বাঁধ ও বেড়িবাঁধের বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও ঘাস। বাংলাদেশে যেসব পশুখাদ্য কৃষিশিল্প উপজাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে খড়, আখের আগা ও ছোবড়া ইত্যাদি, কৃষিজাত শস্যের অবশিষ্টাংশ; কৃষিশিল্পের উপজাত ঝোলাগুড়, খইল, আনারসের বর্জ্য, চিংড়ির বর্জ্য ইত্যাদি এবং মিলের উপজাত ভুসি। সবুজ আহার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাস্তার ধার, বেড়িবাঁধ, বাঁধ ইত্যাদিতে অ-চাষকৃত অবস্থায় জন্মানো দেশি ঘাস; কাঁঠালপাতা, আমপাতা ও ইপিল-ইপিলের পাতা এবং শাপলা, ডোল ঘাস, অ্যাজোলা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ। পশুখাদ্যের জন্য অনেক সময় বহুবর্ষজীবী ও মৌসুমি উদ্ভিদও লাগানো হয়। বহুবর্ষজীবীরা হলো নেপিয়ার, পারা, জার্মান, স্পেনডিডা, অ্যান্ড্রোপগন ও গ্যাম্বু ঘাস। মৌসুমি শস্যের মধ্যে রয়েছে ভুট্টা, মটর, খেসারি, যব, শণ ইত্যাদি। সাধারণত ধান, গম, ডাল ইত্যাদির অবশিষ্টাংশ রোমন্থকদের আহার্যের সিংহভাগ যোগায়। এ তুলনায় গাছের পাতা, দেশিয় ঘাস ও পশুখাদ্যের জন্য চাষকৃত উদ্ভিদের যোগান যৎসামান্য। পশুখাদ্যের জন্য ভাদই ও রবিচাষের অধীন জমির পরিমাণ প্রায় ৬,৩১২ হেক্টর এবং

এ থেকে তাদের খাদ্য উৎপাদন হয় প্রায় ৪৭,০০০ মে টন। দেশে পশুখাদ্যের জন্য নগণ্য পরিমাণ দানাশস্য মিলে। জানা যায় যে, গৃহপালিত পশুর জন্য দেশে প্রায় ১৯০,০০০ মে টন দানাশস্য পাওয়া যায় যা সর্বমোট পশুখাদ্যের চাহিদার প্রায় ১৫.৭%।

গরু মোটাতাজাকরণ (Cattle fattening) উন্নতমানের খাদ্য সরবরাহ ও পরিচর্যার মাধ্যমে গবাদি পশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং ওজন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের পশুসম্পদ প্রধানত গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও হাঁস-মুরগিভিত্তিক। প্রতি একক এলাকায় গরু-মহিষের ঘনত্ব বেশি হলেও এদের উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত নিম্নমুখী এবং তা প্রধানত অপর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ এবং নিম্ন বংশানুসৃতির জন্য হয়ে থাকে। ফলে এদের বাড়বাড়ন্ত খুবই কম। বাংলাদেশে গরু মোটাতাজাকরণের পরিকল্পিত কর্মসূচি সচরাচর অনুসৃত হয় না, যদিও আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য এ ধরনের কর্মসূচি অত্যন্ত জরুরি। অধিকন্তু একটি মুসলিম প্রধান দেশ বিধায় এখানে ঈদ-উল-আজহা'র সময়ে গোমাংসের একটি মৌসুমি চাহিদাও রয়েছে। প্রতি বছর কোরবানির সময় প্রায় ১৮ লক্ষ গবাদি পশু জবাই করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে সচরাচর গরুর মাংস যোগায় অকেজো বয়স্ক বলদ ও গাভী, খামারের অনুপযোগী গবাদি পশু এবং অংশত প্রতিবেশী দেশ থেকে সংগৃহীত গরু। উঠতি বয়সের পশু থেকে আসে মাংসের মাত্র ১০-১২%। ঈদ-উল-আজহা'র সময় মানুষ সাধারণত কোরবানির জন্য সুঠামদেহী পশুই বেশি পছন্দ করে। সম্প্রতি অনেকেই উন্নত জাতের (দেশী ও বিদেশি গবাদি পশুর সংকরায়ণের মাধ্যমে) গবাদি পশুর ছোট দুগ্ধখামার স্থাপন করেছে। একই সঙ্গে কিছু খামারী উন্নত প্রজনন ব্যবস্থায় এঁড়ে-বাছুরকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুখাদ্য যুগিয়ে পরিকল্পিত মোটাতাজাকরণ কর্মসূচি নিয়েও এগিয়ে আসছে।

বাংলাদেশে গরু মোটাতাজাকরণে সাধারণত ১-২ বছর বয়সী এঁড়ে বাছুরকে প্রচলিত ও অপ্রচলিত আহার্য যুগিয়ে প্রতিদিন এগুলির ওজন প্রায় ১ কেজি বাড়ানো যায়। অন্যদিকে ১-২ বছর বয়সী স্থানীয় জাতের আনুমানিক ৯৮ কেজি ওজনের বাছুরকে বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি (ইউরিয়া, চিটাগুড় ও খড়মিশ্রিত খাদ্য) অনুযায়ী খাদ্য খাওয়ালে ওজন বাড়ে প্রতিদিন প্রায় ৪৫০ গ্রাম। গরু মোটাতাজাকরণ কার্যক্রম বাংলাদেশে দিনে দিনে বৃদ্ধি পেলেও বর্তমানে প্রচলিত খাদ্যের উৎপাদনশীলতা, খাওয়ানোর ধরন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি।

বাথান (Pasture land) গবাদি পশুচারণের জন্য ব্যবহৃত ঘাসক্ষেত। চাষাবাদের অনুপযোগী জমি অর্থাৎ পাহাড়ি বা পাথুরে ভূমি, পতিত জমি ইত্যাদিও চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফসল তোলার পর ক্ষেতজমি ও মাঠে পশুচারণ চলে। বাংলাদেশে তেমন সুনির্দিষ্ট পশুচারণ এলাকা অতীতে থাকলেও বর্তমানে নেই। বন সংলগ্ন সামাজিক চারণভূমি কোথাও কোথাও আছে।

বাংলাদেশে রাস্তার পাশে, বাঁধের ধারে ও অনাবাদী হিসেবে চাষযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ ২৬ হাজার হেক্টর। সব ধরনের রোমন্থক প্রাণী চরানো হলেও এগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। এগুলিতে তৃণগুল্মের প্রাচুর্য একান্তই মৌসুমি এবং প্রতি কর্তন থেকে বর্ষাকালে হেক্টর প্রতি ২০ মে টন পর্যন্ত তাজা জীববস্তু (biomass) তোলা যায়। কিন্তু শুকনো মৌসুমে (ডিসেম্বর-এপ্রিল) এসব চারণভূমিতে সামান্য ঘাষ হয় বা কিছুই হয় না। এগুলির জীববস্তুর মধ্যে আছে স্থানীয় নানা ঘাস, প্রধানত দুর্বা (*Cynidon dactylon*)। মিশ্র আগাছার রাসায়নিক উপাদানগুলিতে ঋতু অনুসারে ভিন্নতা দেখা যায়। প্রচলিত খড়ের তুলনায় এসব চারণভূমির বিপাককৃত শক্তি ও প্রোটিন ধারণের পরিমাণ (১০-২১%) অপেক্ষাকৃত অধিক।

বৃহত্তর পাবনা জেলায় স্থানীয়ভাবে বাথান হিসেবে পরিচিত সুচিহ্নিত মৌসুমি চারণভূমি আছে। এ বাথান প্রায় ৬০০০ হেক্টর জুড়ে আছে বড়াল ও গয়লা নদীর অববাহিকায়। এলাকাটি বর্ষায় পানির নিচে তলিয়ে যায়, কিন্তু নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত শুষ্ক থাকে। বাথান রোমন্থক প্রাণীদের মৌসুমি শুঁটিজাতীয় পশুখাদ্যের একটি অনন্য উৎস। মাষকলাই এবং খেসারি এখানকার প্রধান প্রজাতি যেগুলির বীজ পলিভরা নদীখাতে সাধারণত কোনো চাষ ছাড়াই বোনা হয়। এসব শুঁটি ফসলের জীববস্তুর পরিমাণ হেক্টরপ্রতি ৪-৬০ মে টন। কৃষকরা এ বাথানে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সরাসরি তাদের গবাদি পশু চরায়। অতঃপর বাথান ঘাসে ঢাকা পড়ে যতক্ষণ না বন্যায় আবার তলিয়ে যায়। একই বাথান ব্যবস্থা আছে মুন্সিগঞ্জ ও টেকেরহাট এলাকায়ও। উল্লিখিত অঞ্চলের গরুগুলি অধিক উৎপাদনশীল এবং মিল্ক ভিটা সমবায়ের দুধের প্রধান উৎস। [কাজী এম ইমদাদুল হক]

আরও দেখুন প্রাণিসম্পদ।

এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:৫৫টার সময়, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে।

গোপনীয়তার নীতি বাংলাপিডিয়া বৃত্তান্ত দাবিত্যাগ প্রবেশ

Powered By MediaWiki